শিশু-কিশোর সিরিজ

গল্পে আঁকা ইতিহাস-২

# অপরাধী ও পুলিশ

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
অনূদিত

শিশু-কিশোর সিরিজ
গল্পে আঁকা ইতিহাস-২

আলী তানতাভী

# অপরাধী ও পুলিশ
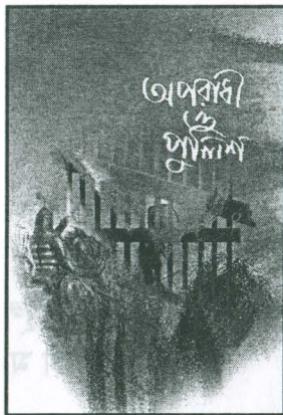
অনুবাদ
ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা

শিশু-কিশোর সিরিজ
# গল্পে আঁকা ইতিহাস-২

লেখক : আলী তানতাভী
অনুবাদক : ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৮ ঈ.

কিতাব কানন, দোকান নং- ৪০ (দোতালা), ১১ বাংলা বাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারি প্রেস স্বামীবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
বশির মেসবাহ

মূল্যঃ
৪০.০০ টাকা মাত্র

Shishu Koshur Series: Golpe Anaka Etihash- { History in drawn Story} by Ali Tantawi, Translated by Yahya Yusuf Nadwi, Published by : Kitab Kanan, Islami Towar, 11 Bangla Bazar, Dhaka. Price : $ 3 only £ : 2 only

শিশু-কিশোর সিরিজ

গল্পে আঁকা ইতিহাস-২

# অপরাধী ও পুলিশ

# অপরাধী ও পুলিশ

## কে এই বন্দি!

আলেফ লায়লা'র খলীফা হারুন রশীদ। তাঁর পুত্র খলীফা মামুন রশীদের যুগের ঘটনা। তাঁর পুলিশ বিভাগের প্রধান ছিলেন– আব্বাস। আমি তোমাদের সামনে ইতিহাসের যে গল্প নিয়ে বসেছি সে গল্পের প্রধান দুই চরিত্রের একজন হলেন এই আব্বাস। সুতরাং তার মুখেই শোনা যাক ঘটনার বিবরণ–

'আমি খলীফা আল-মামুনের পুলিশ বিভাগের প্রধান। আমার নাম– আব্বাস। একদিন খলীফা আমাকে তলব করলেন একদম সন্ধ্যাবেলায়। গিয়ে দেখি, তাঁর সামনে শেকলবাঁধা এক বন্দি। গুরুগম্ভীর স্বরে খলীফা আমায় কাছে ডাকলেন–
'আব্বাস!'

'হুকুম করুন আমীরুল মু'মিনীন!'
'বন্দিকে তোমার হেফাজতে রাখো। ভোর বেলা আমার সামনে হাজির করবে। সাবধান! পালায় না যেনো। তাহলে কিন্তু তুমিই দায়ী হবে।'

ব্যাপারটার নাজুকতা উপলব্ধি করে আমি পুলিশ ডাকলাম। বললাম–
'কড়া পাহারায় একে আমার সাথে নিয়ে চলো।'
পথে এসে ভাবলাম– একে যদি কয়েদখানায় রাখি আর

কোনোভাবে পালিয়ে যায়, তাহলে আমাকেই পড়তে হবে খলীফার রোষে। সুতরাং একে আমার বাড়িতে আমার চোখের উপর রাখাই অধিক নিরাপদ।
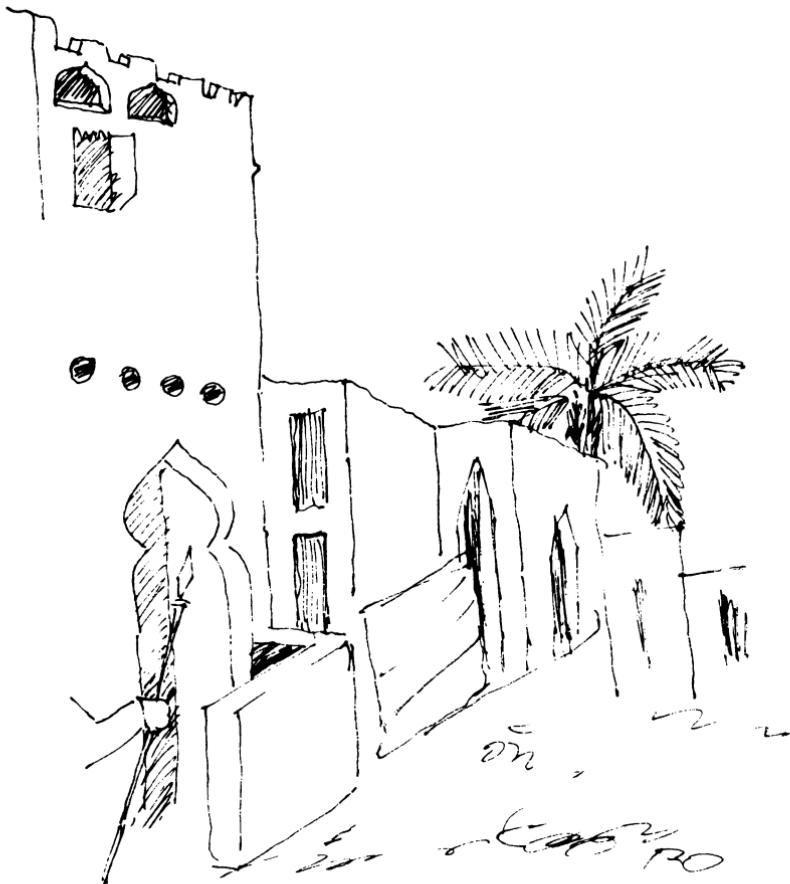
## কেনো তোমার এই বন্দি-দশা?

ঘরে পৌঁছেই আমি বন্দিকে নিয়ে বসলাম। গভীর দৃষ্টিতে তাকে

পর্যবেক্ষণ করলাম। অপরাধ আর অপরাধী নিয়েই তো আমার কারবার! তাই কে কোন্ ধরনের অপরাধী প্রথম নজরেই আমি বুঝতে পারি। এ-লোকের চেহারায় কিন্তু অপরাধের কোনো ছাপ আমি দেখতে পেলাম না। বরং আভিজাত্য ও ভদ্রতা এবং সরলতা ও কোমলতার ছাপই আমার নজরে পড়লো। মনে মনে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। বললাম–

'তোমাকে তো বেশ ভদ্র ও অভিজাত মনে হচ্ছে। খুলে বলো তো– কে তুমি? কী তোমার পরিচয়? কেনো তোমার এই বন্দি-দশা? আমীরুল মু'মিনীন কেনো তোমার প্রতি এতো রুষ্ট?'

তখন লোকটি কিছুক্ষণ আমার দিকে 'চেনা চেনা' চোখে তাকিয়ে থেকে উদাস কণ্ঠে বললো–

'আমার বাড়ি দামেস্ক।'

## স্মৃতিময় দামেস্ক!

শেকলবাঁধা বন্দির মুখে 'দামেস্ক' শব্দটা শোনা মাত্রই অতীতের একটা বিস্মৃতপ্রায় মধুময় স্মৃতি আমার মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিলো। আমি 'দামেস্ক' উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। আপন মনে বলে উঠলাম–

'হে আল্লাহ! দামেস্কের প্রিয় মাটি চিরকাল তোমার করুণা-বর্ষণে সিক্ত হোক!'

আমি এরপর লোকটির দিকে মায়া-মায়া চোখে তাকিয়ে বললাম–

'বন্দি! তোমার দামেস্কের কাছে আমি চিরঋণী। সেখানে এমন এক মহানুভব মানুষের দেখা পেয়েছিলাম আমি, যার উপকার আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না। কতোদিন কতোজনকে আমি বলেছি তাঁর কাহিনী। এমন কি আমার ছোট্ট মেয়েটিও স্মরণ করে

আমার উপকারী সেই বন্ধুকে। এখনো দামেস্কের কোনো কাফেলার সাথে দেখা হলে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে যাই। তাদের কাছে ব্যাকুলচিত্তে জানতে চাই– দামেস্কের খবর। সেই উপকারী বন্ধুর কথা।'

লোকটি তখন মৃদু করুণ হেসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো–
'কী নাম তার?'
আমি নাম বলে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম–
'কেনো তুমি চেনো তাঁকে?'
লোকটি উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বললো–
'কী উপকার করেছে সে আপনার?'
আমি বললাম–
'শোনবে?' এরপর আমি তার জবাবের অপেক্ষা না করেই বলতে শুরু করলাম তাঁর কাহিনী–

'সে বেশ আগের কথা। আমি তখন দামেস্কে বাস করি। দামেস্কের শাসনকর্তার অধীনে চাকরি করি। দামেস্কের জীবন ও প্রকৃতি বড়ো অদ্ভুত! এমনিতে মানুষ সেখানে বেশ শান্ত, ভদ্র। কিন্তু কখনো কোনো কারণে তারা যদি জ্বলে উঠে, তাহলেই বিপদ! মুহূর্তেই দৃশ্যপট বদলে যায়। এই শান্ত মানুষগুলোই হয়ে উঠে অশান্ত ও ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ।

দামেস্কের আবহাওয়া যেমন স্বাস্থ্যকর তেমনি প্রশান্তিকর। কিন্তু মাঝে-মধ্যেই সেখানে বয়ে যায় তপ্ত লু-হাওয়া। যার নাম– 'বুরকান'। একবার আমরাও পড়েছিলাম এই ভয়ংকর 'বুরকান'-এর কবলে। তখন শহরবাসীর সে কী কষ্ট! আমরা কয়েকজন শাসনকর্তার প্রাসাদে ছিলাম তাই বাঁচুয়া। সন্ধ্যাটা ভালোয় ভালোয়

পার করতে পারলেও বিপত্তি দেখা দিলো অন্যখানে। শহরে হঠাৎ করে দেখা দিলো গোলযোগ ও মারদাঙ্গা। বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো সারা দামেস্কে। জনতা ফুঁসে উঠলো রুদ্ররোষে। ঘেরাও করলো আমীরের প্রাসাদ। দাবি তাদের একটাই– আমার এবং আমীরের কল্লা চাই! কেনো তাদের এ-দাবি– তার কিছুই জানি না আমরা। শুধু জানি– এখান থেকে আমাদেরকে যে কোনো উপায়েই হোক পালাতে হবে।
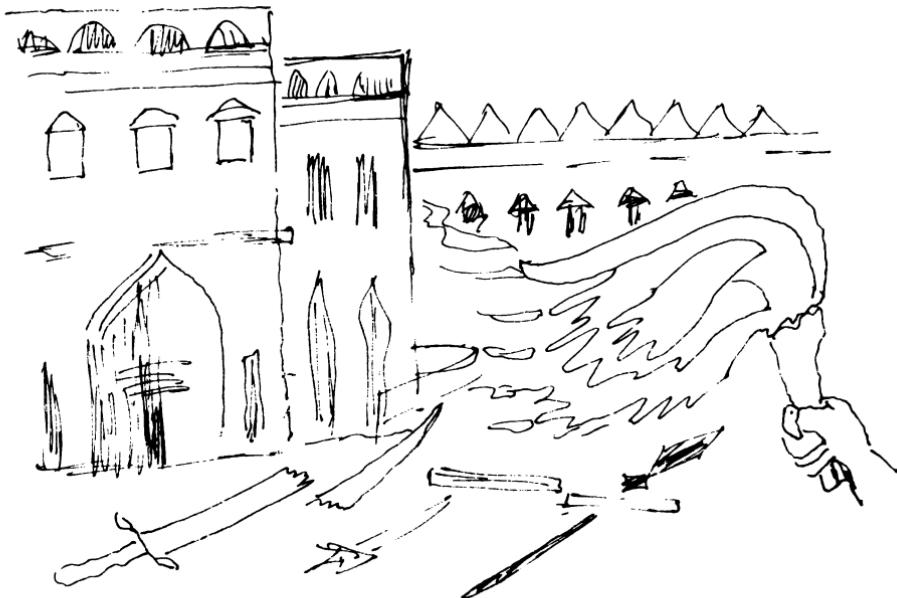
## তারপর কী ঘটলো?

জানালা দিয়ে দেখছিলাম আমরা বিদ্রোহী জনতার ফুটন্ত রোষ। হিংস্রতার এমন ভয়াল রূপ জীবনে কখনো দেখি নি আমি। ভীষণ

ভড়কে গেলেন আমীর। ভড়কে গেলাম আমিও। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিলো ওরা যে কোনো মুহূর্তে প্রাসাদে ঢুকে পড়তে পারে। ঢুকে পড়লে পরিণতি যে কী হবে– তা ভাবতেই গা শিউরে উঠলো!

এখন তাহলে কী করা?

জীবন তো বাঁচাতে হবে!

নিজের জীবন রক্ষার চেয়ে আমীরের জীবন রক্ষার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কী উপায়ে কী করবো– বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ মাথায় এলো একটা বুদ্ধি। ঝুড়িতে রশি বাঁধলাম। তারপর আমীরকে সাবধানে ঝুড়িতে বসিয়ে অনেক কষ্টে জানালা পথে একটা অন্ধকার ও নিরাপদ গলিতে নামিয়ে দিলাম!

পরে আমি কোনোমতে জনতার রুদ্ররোষ এড়িয়ে অন্ধকারকে আশ্রয় করে কীভাবে যে পালিয়ে এসেছিলাম, সে কথা এখন আর বলতে চাই না। আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানী যে, স্ত্রী-পুত্ররা সাথে ছিলো না। থাকলে কী অবস্থা হতো, তা আল্লাহ মা'লুম! অন্ধকারে তখন নিজের হাতের অস্তিত্বও অনুভব করা সম্ভব ছিলো না। দিকভ্রান্তের মতো হোঁচট খেয়ে খেয়ে পড়ছিলাম আবার উঠে উঠে ছুটছিলাম। কোনো লক্ষ্য ছিলো না। কোনো গন্তব্য ছিলো না। ছিলো শুধু বাঁচার উদগ্র ইচ্ছা।

## আশ্রয় ঃ দয়া হলো এক দয়াবানের!

দূর থেকে একটা আলো দেখতে পেলাম। সেটা ছিলো একটা বড় বাড়ি। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলাম আলোটাকে লক্ষ্য করে। কাছে এসে দেখলাম– বাড়ির সদর দরোজায় সৌম্যশান্ত এক লোক দাঁড়িয়ে আছেন। হয়তো আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এসেছেন। আমার মন বললো– 'এর উপর তুমি নির্ভর করতে পারো!' আমি তার

কাছে এসে অসহায়ভাবে বললাম–
'ভাই! আমি আল্লাহ্‌র পর তোমার আশ্রয়প্রার্থী। তোমার কাছে আমার কোনো বিপদ নেই তো?'
লোকটি তখন আমাকে নিরীক্ষণ করে বললো–
'মনে হচ্ছে তুমি বিপদগ্রস্ত। ভয় নেই, নিশ্চিন্তে ভিতরে এসো!'

লোকটির কণ্ঠে আমি দরদ, ভালোবাসা ও মানবতার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি অভিভূত হলাম। একঝাঁক নিষ্ঠুর জল্লাদের রক্তচোখ এড়িয়ে এসে এমন দয়া-মায়া জড়ানো কণ্ঠের সামনে দাঁড়িয়ে আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। সামনে পা'ও বাড়াতে পারলাম না। নিথর দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। আমার আরো কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর হাত ধরে নিজেই হাসিমুখে ভিতরে নিয়ে গেলেন। কী যে ভালো লাগছিলো তখন! কৃতজ্ঞতায় মাথা আমার বারবার নত হয়ে আসছিলো।

সংকীর্ণ ও অন্ধকার একটা সিঁড়ি বেয়ে উপরের ছোট্ট একটা কামরায় তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন এবং আত্মগোপনের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমার উপস্থিতির কথা জানলেন শুধু তিনি আর তাঁর স্ত্রী।

## তল্লাশী

আমি এবং গৃহস্বামী যা আশংকা করছিলাম তাই সত্য হলো। শিকারী যেভাবে হাতছাড়া শিকার খোঁজে সেভাবে এখানেও একদল লোক এসে চড়াও হলো। যে হিংস্রতা দেখেছিলাম আমীরের প্রাসাদ-ঘেরাওকারীদের মাঝে সে একই হিংস্রতা ছিলো এদেরও মাঝে। আমাকেই খুঁজছিলো তারা। গৃহস্বামী কুশলী ও শান্ত ভাষায় যতোই তাদের বোঝাতে চাইলেন যে, এখানে কেউ নেই ততোই তারা উত্তেজিত ভাষায় ঘর তল্লাশীর দাবি জানাতে লাগলো।

অবশেষে তিনি অনুনয়ের স্বরে বললেন–
'আমার স্ত্রী মানসিকভাবে অসুস্থ। শোরগোল তার জন্যে ভয়ের কারণ। তাই তোমরা দয়া করে দু'একজনকে ভিতরে পাঠাও। তারা ইচ্ছেমতো তল্লাশী করুক।'

যে দু'জন ভিতরে এসে খোঁজাখুঁজি করছিলো এক সময় তাদেরকে সোজা আমার কামরার দিকে আসতে দেখলাম। ভয়ে আমার তখন কী কম্পমান অবস্থা ছিলো, তা ভাবতেও শরীর কাঁটা দিয়ে উঠে। সম্ভবতঃ পরিস্থিতির নাজুকতা আঁচ করেই গৃহকর্ত্রী ভয়ার্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন। তখন লোক দু'টি কী ভেবে যেনো ফিরে গেলো।

কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হওয়ার শংকা আমার কাটলো না। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর ছায়া দেখে দেখে আমার অস্থির বেলা কাটতে লাগলো। গৃহস্বামী সুযোগমতো আমাকে এসে দেখে যেতেন। পাশে বসে বসে অভয়বাণী শোনাতেন। সান্ত্বনা দিতেন। সমবেদনা জানাতেন। পরিবারের সবার নজর এড়িয়ে খাবার দিয়ে যেতেন। গৃহস্বামীর চোখ-মুখ দেখে মনে হতো, বিপদ আমার, কিন্তু দুশ্চিন্তা ছিলো যেনো সবই তাঁর। কতো মহান ছিলেন তিনি! কতো মানবদরদী ছিলেন তিনি!!

## কেনো আর আসেন না তিনি?

এরপর বেশ কিছুদিন গৃহস্বামীর সাথে আমার দেখা হলো না। তাঁর এই অনুপস্থিতির প্রকৃত কারণও আমি জানতে পারলাম না। তবে এতোটুকু আঁচ করতে পারলাম যে, তিনি কোনো বিপদে পড়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে আমার সেবা-যত্নের

কোনো ক্রুটি হলো না। অযত্ন অবহেলায় কিংবা না-খেয়ে আমাকে একবেলাও কাটাতে হয় নি।

কর্তার হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ার কারণে গৃহকর্ত্রী স্বভাবতই খুব চিন্তিত ও পেরেশান ছিলেন। কিন্তু আমাকে তিনি কিছুই বুঝতে দেন নি। ঠিক সময়েই আমার সামনে খাবার হাজির হয়ে যেতো এবং পর্দারও কোনো ব্যঘাত হতো না। তিনি গোপনীয়তার কারণে নিজেই এসে আমার কামরার সিঁড়ির অর্ধেক পর্যন্ত খাবার রেখে যেতেন আর বাকি অর্ধেক নেমে আমি সেই খাবার তুলে আনতাম। ময়লা কাপড়-চোপড় বাইরে রেখে দিতাম আর তিনি পরিস্কার করে কাগজে পেঁচিয়ে সিঁড়িতে রেখে যেতেন। এভাবে পর্দার আড়াল থেকে তিনি আমার সব রকম সেবা-যত্ন করে যাচ্ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, এমন সৎ ও সদয় স্ত্রী-পুরুষ জীবনে আমি আর কখনো দেখি নি।

## অমন মানুষকেও মানুষ মারতে পারে!

কিছুদিন পর এক সন্ধ্যায় গৃহস্বামী ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষত-বিক্ষত ও বিধ্বস্ত শরীর দেখে আমি আঁতকে উঠলাম। তিনি কিছু না বললেও আমার বুঝতে বাকি থাকলো না যে, নিপীড়ন ও নির্যাতনের কী ভয়াবহ ঝড় বয়ে গেছে তাঁর উপর দিয়ে। আর এর কারণ যে আমি তা বুঝতে পেরে আমার লজ্জা ও অনুশোচনার কোনো সীমা রইলো না।
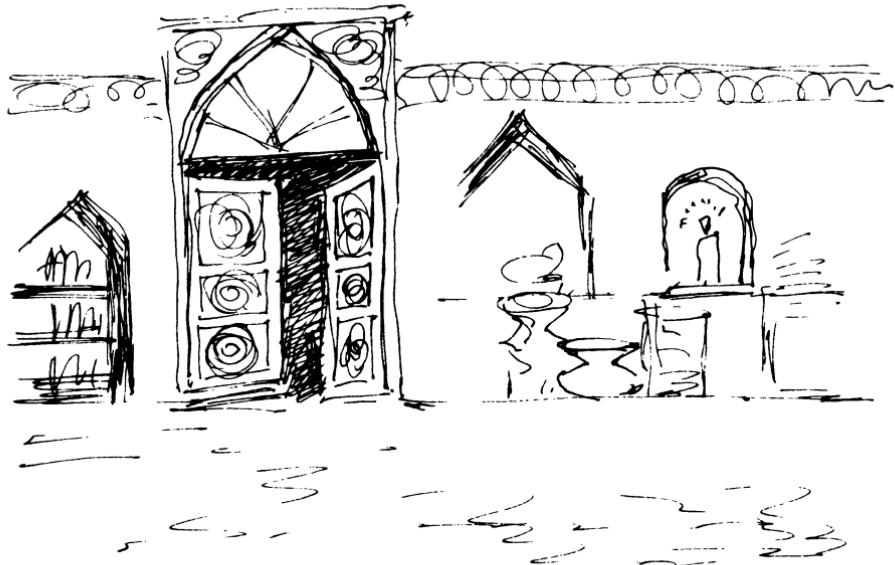
হায়! এমন সোনার মানুষটাকে এভাবে মারতে ওদের হাত একটু কাঁপলোও না! কেনো আমি তাঁর নিখোঁজ হওয়ার সাথে সাথে বিষয়টা আঁচ করতে পারলাম না? আমি যদি স্বেচ্ছায় গিয়ে জালিমদের হাতে ধরা দিতাম তাহলে কি এই শরীফ নিরপরাধ

মানুষটার এই করুণ দশা হতো?

লজ্জায়-অনুশোচনায় আমি এমন কাতর হয়ে পড়লাম যে, গৃহস্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারছিলাম না। কিন্তু তিনি বারবার আমাকে বিভিন্নভাবে প্রবোধ দিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন– 'আপনার সাথে আমার এ-দুর্দশার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি অন্য একটা দুর্ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েছিলাম।'

পরে অবশ্য আমি সব জানতে পারলাম। যে কোনো কারণেই হোক বিদ্রোহীদের সন্দেহ পোক্ত হয়ে গিয়েছিলো যে, গৃহস্বামীই আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। তাই বিদ্রোহীরা বাজারে তাঁর দোকান থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। তারপর শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্দয় বেত্রাঘাত। কিন্তু ওদের সকল নির্দয়তার মুখেও তিনি যখন আমার ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি হলেন না, নরপশুরা তখন তাঁকে বন্দি রেখে দিনের পর দিন নির্যাতন চালিয়েছে।

জালিমদের সব অত্যাচার তিনি সহ্য করেছেন, কিন্তু মুখ খুলেন নি। শেষ দিন যখন নির্যাতনের মাত্রা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেলো এবং তাঁর সহ্যশক্তিও ফুরিয়ে গেলো তখন তিনি তাদেরকে অনুনয় করে বললেন–

'দেখো! আর জুলুম না করে তোমরা আমাকে একেবারে মেরেই ফেলো। শোনো! আমি যদি তাঁকে আশ্রয় দিয়েও থাকি তাহলে আরব রক্তের কাছে কীভাবে তোমরা আশা করছো যে, নিজের জীবন বাঁচাতে আমি আমার আশ্রিত মেহমানকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো?!

আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি জানতাম, তবু তার খবর তোমাদেরকে

বলতাম না। এখন তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করো! তবে মনে রেখো, একদিন অবশ্যই বিচারের জন্যে আল্লাহ্‌র সামনে তোমাদেরকে দাঁড়াতে হবে! সেদিন কী জবাব দেবে?'

কণা পরিমাণ ঈমানও যাদের অন্তরে আছে আল্লাহ্‌র ভয় এক সময় না এক সময় তাদের বিচলিত করেই। শত হোক, এই জালিমরাও মুসলমান ছিলো। তাই পরকাল আর আখেরাতের কথা মনে করিয়ে দিতেই তারা দমে গেলো এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলো।

## সোনালী সেই দিনগুলো!

গৃহস্বামীর আশ্রয়ে একটা দীর্ঘ সময় কেটেছে আমার। একে একে চারটি মাস। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি আমার পুরো হক আদায় করেছেন এবং সব রকম আরামের ব্যবস্থা করেছেন। তারপরও আমার অসুবিধা হচ্ছে– এই ভেবে সব সময় তিনি কুণ্ঠিত থাকতেন।

আহা! কতো মহৎ ছিলেন আমার সেই আশ্রয়দাতা! সেখানে আমার চাওয়ার অভাব ছিলো কিন্তু পাওয়ার বিলম্ব ছিলো না। প্রায়ই আমার মনে প্রশ্ন জাগতো– নিজের একান্ত আত্মীয়ের বাড়িতে এমন কি নিজের বাড়িতেও তো মানুষ এতো আদর-যত্ন পায় না? কতোদিন ধরে আমি এখানে পড়ে আছি– অথচ ইশারা-ইঙ্গিতেও কোনোদিন তাঁরা বোঝাতে চান নি–

কে আমি?

কী আমার পরিচয়?

কোন্ অপরাধে আমি অপরাধী?

## বিদায়, বিদায় হে দামেস্ক!

শহরের পরিস্থিতি যখন কিছুটা শান্ত হয়ে এলো এবং আমাকে খুঁজে বের করার উৎসাহেও যখন ভাটা পড়লো তখন গৃহস্বামীকে আমার অন্তরের অন্তঃস্তলের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম–
'আমি যদি বাগদাদ যেতে পারি তাহলে ভালো হয়!'
তিনি বললেন–
'তিনদিন পর বাগদাদের উদ্দেশ্যে এক কাফেলা রওয়ানা হবে। সেই কাফেলায় ছদ্মবেশে শরীক হলেই ভালো হয়।'

সফরের ইন্তিযাম (ব্যবস্থা ও আয়োজন) কীভাবে হবে– তা ভেবে আমি চিন্তিত ছিলাম। কেননা আমার হাতে তখন কোনো উপায় বা সম্বল ছিলো না। সামান্য হাতখরচও ছিলো না। কিন্তু একটা ব্যবস্থা না করলে দূরের সফরে কীভাবে নামবো? এদিকে সংকোচের কারণে গৃহস্বামীকে কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারি নি। এমনিতেই দীর্ঘ চার মাস ধরে তাদের মহানুভবতা ও মেহমানদারির ভিতরে মায়ের আদরে ছিলাম, তার উপর নতুন করে তাদের কাছে কিছু চাইতে কিছুতেই আমার কৃতজ্ঞ মন সায় দিচ্ছিলো না। এ-সব ভাবতে ভাবতে প্রায় নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছিলাম।
কিন্তু কাফেলা যেদিন রওয়ানা হবে সেদিন ভোরে গৃহস্বামী ও তাঁর স্ত্রী আমাকে বিদায় জানাতে এলেন। তখনই শুরু হলো–
আমার অবাক হওয়ার পালা!
কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত হওয়ার পালা!
আনন্দে-উত্তেজনায়-আবেগে মাথা নীচু করার পালা!
অশ্রুপূর্ণ চোখে দু'জন মহানুভব মানুষের মহানুভবতা দেখার পালা!
কী দেখলাম আমি?
আমি দেখলাম–

এই তিনদিন তাঁরা আমার চেয়েও বেশী ভেবেছেন আমার সফর নিয়ে! যাবতীয় ইন্তিযাম সম্পন্ন করে এখন তাঁরা আমাকে 'বিদায়!' বলতে এসেছেন। পাঁচ হাজার দিরহামের একটি থলে প্রায় জোর করে তাঁরা আমার হাতে তুলে দিলেন!
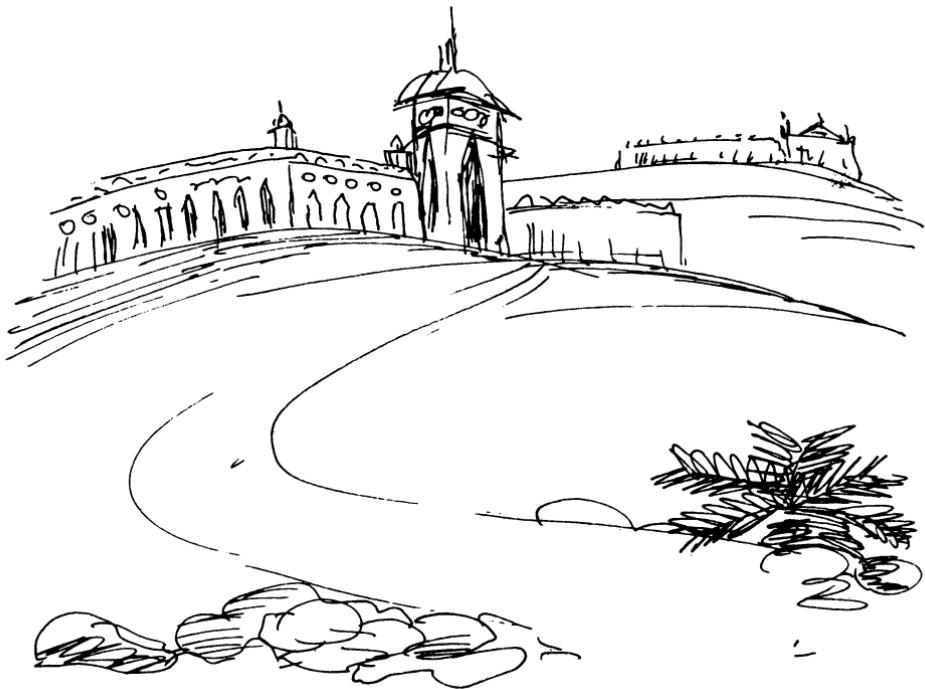
তারপর?

তারপর বিনয়-বিগলিত হয়ে তাঁরা আমার কাছে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগলেন!

কেনো এই ক্ষমা?

এই ক্ষমা– তাঁদের দৃষ্টিতে মেহমানদারীতে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে বলে!

আমি তাঁদের আচরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাটুকুও হারিয়ে ফেললাম! মহানুভবতার এমন শীতলধারায় সিক্ত হলে জবাব দেবার ভাষা ক'জন খুঁজে পায়? আমি মুগ্ধ হলাম, ভীষণ মুগ্ধ। আমি সিক্ত হলাম, ভীষণ সিক্ত। মুগ্ধচিত্তের অভিব্যক্তি মেশানো ঝাপসা চোখে তাঁদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম! আমার ভাষাহীন চোখ দু'টো বলছিলো–

এঁরা মানুষ না ফেরেশতা?

মানুষ এতো ভালো হয়?

মানুষ এতো মহৎ হয়?

মানুষ কি এমন করে পারে– পরকে আপন করে নিতে?

এইসব মহৎ মানুষের জন্যেই বুঝি–

আজো পৃথিবীটা টিকে আছে?

রক্ষা পাচ্ছে মানবতার লাজ?

কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা বারবার নুয়ে এলো। হৃদয়-মন আপ্লুত হলো। কিন্তু হৃদয়ের সে ভাব প্রকাশ করার কোনো ভাষা বারবার চেষ্টা করেও আমি খুঁজে পেলাম না। মনে মনে শুধু প্রতীজ্ঞা করলাম–

আল্লাহ যদি কখনো সুযোগ দেন তাহলে একদিন এই মহানুভবতার প্রতিদান দেবো। দিতে চেষ্টা করবো।'

## চোখ মেলে তাকাও!
## চোখে চোখে চোখ রাখো!

আমার কথা শেষ হলো। শেকলবাঁধা বন্দি তখন ম্লান হেসে বললো–

'আমার দিকে তাকাও! দেখো আমায় চিনতে পারো কি না! হ্যাঁ, আমিই তোমার সেই হতভাগ্য মেজবান! তোমার সেই আশ্রয়দাতা! জুলুম ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আজ আমি বন্দি, দেশোদ্রোহী! হয়তো আগামীকালের সূর্যোদয়ই আমার জীবনের শেষ সূর্যোদয়!'

কিছুক্ষণের জন্যে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকলাম!

আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না!
হ্যাঁ, সত্যিই তো!
এই তো আমার সামনেই বসে আছেন–
আমার খোঁজে-ফিরা সেই বন্ধু!
আমার সেই মহানুভব মেজবান!
সেই অতি মানবীয় গুণের মানুষটি!
এতোক্ষণ কেনো আমি তাঁকে চিনতে পারলাম না?
কী লজ্জা!

স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা-কৃতজ্ঞতা ও দরদ-হামদর্দির বিভিন্ন অনুভূতি এক সাথে যেনো আমার হৃদয়ে তোলপাড় করতে লাগলো! আমি উঠে গিয়ে পরম মমতায় তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম! তাঁর ঘর্মাক্ত ললাটে চুম্বন করে বললাম– 'বন্ধু! ক্ষমা করো বন্ধু! ক্ষমা করো এ-অধমকে! অনেক দেরী হলো চিনতে তোমাকে! খুলে বলো আমাকে তোমার ঘটনা! তুমি যে নিরপরাধ– সে আমি বিশ্বাস করি! অবশ্যই বিশ্বাস করি! কার রোষানলে পড়ে তোমার এই বন্দি-দশা?!'
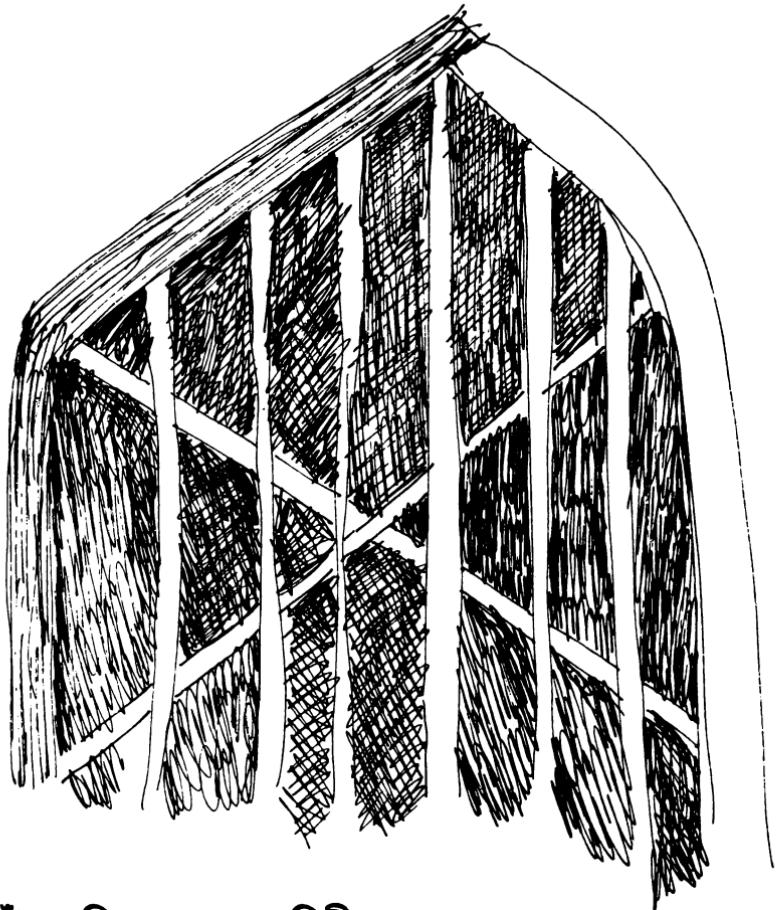
## তাঁর বন্দি হওয়ার কাহিনী

আমার ‘শরীফ’ (ভদ্র, অভিজাত) মেজবান এ-ভাবে শুরু করলেন তাঁর বর্তমান দুর্দশার কাহিনী–

‘তোমার সময়ে যেমন, তেমনি এক গোলযোগ দেখা দিয়েছিলো দামেস্কে। সে সুযোগে আমার কিছু দুশমন এ-কথা মশহুর করে (ছড়িয়ে) দিলো যে, আমিই হলাম সেই গোলযোগের নেপথ্য

ইন্ধনদাতা। গোলযোগ দমনের জন্যে আমিরুল মু'মিনীন যে ফওজ পাঠালেন তাদের হাতে আমি বন্দি হলাম। তারা বিনা বিচারে আমার উপর এমন নিষ্ঠুর নির্যাতন চালালো যে, আল্লাহ পানাহ! প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিলো যে, এই বুঝি আমার জান বের হয়ে গেলো!

অবশেষে তারা আমায় শৃঙ্খলিত করে আমীরুল মু'মিনীনের দরবারে পাঠিয়ে দিলো।

আমার পরিবার পরিজনকে আমি কিছুই বলে আসতে পারি নি। তবে দূর থেকে আমাকে অনুসরণ করে বাগদাদ পর্যন্ত এসেছে আমার এক প্রতিবেশী। সম্ভবত সে অমুক স্থানে আছে।

প্রিয় ভাই আমার! তোমার কাছে আমি কোনো প্রতিদান চাই না। শুধু ঐ লোকটির সাথে আমাকে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও– যাতে আমি তার মাধ্যমে আমার পরিবারকে কয়েকটি অসিয়ত করতে পারি। তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত ও দায়মুক্ত হতে পারি।'

## একদিকে আনন্দের বসন্ত-হাওয়া
## আরেকদিকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঝড়ো হাওয়া

এতোদিন পর অমন অপ্রত্যাশিতভাবে আমার প্রিয় মেজবানকে পেয়ে হৃদয় আমার কেমন আনন্দ-উদ্বেলিত হয়েছিলো তা বোঝাবার মতো কোনো উপমা আমার জানা নেই। মনে হচ্ছিলো– যেনো মহা মূল্যবান কোনো হীরকখণ্ড হারিয়ে হঠাৎ আবার আমি তা ফিরে পেয়েছি!

অথবা মনে হচ্ছিলো– আমার আনন্দ যেনো সেই জননীর মতো, যে হাজার হাজার বিনিদ্র রজনী অপেক্ষা করে প্রিয়তম সন্তানকে ফিরে পেয়েছে বুকের মাঝে!

কিন্তু আনন্দোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তখন ছিলো না। কঠিন বাস্তবতা তার বিকট চেহারা নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো।

আমার উপকারী বন্ধুকে কীভাবে আমি বর্তমান বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি? খলীফার আদেশে আমারই যিম্মাদারিতে (দায়িত্বে) তিনি বন্দি। তাঁর সম্পর্কে খলীফার কাছে আমাকেই জবাবদেহী করতে হবে।

দামেস্কে যিনি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন আগামীকাল তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার জন্যে খলীফার পক্ষ থেকে আমি পাহারাদারি করছি– এরই নাম কি উপকারের প্রতিদান?!
কী করবো এখন আমি?
তাঁকে বন্ধনমুক্ত করে শারাফাতের মর্যাদা রক্ষা করবো নাকি আগামীকাল খলীফার দরবারে তাকে হাজির করে খলীফার ওয়াফাদারি রক্ষা করবো?

তাকে মুক্তি দিলে আমাকে জীবন দিতে হবে। সেই সাথে আমার স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার পরিজনের জীবনে নেমে আসবে চরম ভাগ্য-বিপর্যয়। কেউ হবে এতীম, কেউ বিধবা। সুখী-স্বচ্ছল একটি পরিবার হঠাৎ হয়ে যাবে বে-সাহারা, ছিন্নমূল।
অন্যদিকে খলীফার সাথে ওয়াফাদারির পরিচয় দিলে আমার ও আমার পরিবারের ভবিষ্যত হবে নিরাপদ। ইজ্জত ও তরক্কীর রাস্তা হবে উন্মুক্ত। কিন্তু তখন আমি কি ছোট হয়ে যাবো না–
নিজের চোখে?
পরিবারের চোখে?
আমার ছোট্ট সন্তানদের চোখে?

মানবতার চোখে?
আমার মহান মেজবানের চোখে?

এ-ধরনের পরস্পর-বিরোধী চিন্তা আমার অনুভূতিকে ক্রমাগত ক্ষত-বিক্ষত করে চললো। একবার ভাবি– পরিণতি যা হবার হোক, আমি আমার আশ্রয়দাতা 'জীবনদাতা' বন্ধু'র জীবন রক্ষা করবোই। কিন্তু পর মুহূর্তেই সেই ভাবনা তলিয়ে যায় প্রাণপ্রিয় স্ত্রী-পুত্রের ভবিষ্যত চিন্তায়।

মনে হচ্ছিলো– আমার বুকে যেনো এক জগদ্দল পাথর চেপে বসেছে, যার ভারে আমার দম-যায়-যায়-অবস্থা। আমি দু' হাতে মাথা চেপে ধরলাম। ক্রমাগত ভাবতে লাগলাম।
আমার মন বললো–

'খলীফার আদেশ পালন করাই তোমার কর্তব্য। তদুপরি পিতা ও স্বামী হিসাবেও রয়েছে তোমার দায়িত্ব।'

কিন্তু সামনে বসে থাকা দামেস্কের 'জীবনদাতা' বন্ধুর অসহায় মুখমণ্ডলে দৃষ্টি পড়া মাত্রই বিবেক আমাকে শাসন করে বললো–
'প্রাণের মায়ায় ভুলে যাবে তুমি মানবতার মায়া?
ভুলে যাবে উপকারী বন্ধুকে!
এমনই কাপুরুষ তুমি?'

না! কাপুরুষতার অপবাদ আমি সইতে পারবো না!
আমার জীবনে কতো কঠিন ও নাজুক মুহূর্ত এসেছে।
কতো রক্তঝরা যুদ্ধের ময়দানে আমি তলোয়ার চালিয়েছি,
বীর বিক্রমে!
পাহাড় যখন টলে যায় তখনো আমি ছিলাম অটল!
হারানো দিনের সেই ঐতিহ্য তো আমার গরবের ধন!

সেই গর্বিত ইতিহাস সামনে নিয়ে আজ আমি সইবো– কাপুরুষতার অপবাদ? অসম্ভব!

কিন্তু আজ আমি অন্য রকম এক কঠিন সঙ্কটের মুখোমুখি– যা জীবনে এই প্রথম।

কল্পনায় আমি আমার ও আমার পরিবারের ভবিষ্যত ছবি চিন্তা করলাম।

খলীফার রোষানলে পড়ে আমি পদচ্যুত হয়েছি।

কিংবা আমার নামে কতলের হুকুম জারি হয়েছে।

আমার এতীম ছেলেমেয়েরা অসহায় অবস্থায় দ্বারে দ্বারে ঘুরছে।

আমার বিধবা স্ত্রী যিল্লতির জীবন-যাপন করছে।

উহ! আর কল্পনা করতে পারছি না!

আবার কল্পনা করলাম, আমার উপকারী বন্ধুকে আমি জল্লাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আর সবাই আমাকে 'ছি! ছি!!' করছে। এমনকি আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও –যাদের কাছে আমি বহুবার সেই উপকারী বন্ধুর কথা গল্প করেছি– আমাকে 'ছি! ছি!!' করছে।

চারদিকে একটানা 'ছি! ছি!!' শুনতে শুনতে আমি যেনো অস্থির হয়ে পড়লাম। অনন্যোপায় হয়ে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হলাম।

আমার আল্লাহ! আমাকে পথ দেখাও!

বলে দাও আমার করণীয়!

আমার মেজবানের মর্যাদা তুমি রক্ষা করো!

## শেষ পর্যন্ত বিবেক!

আল্লাহ আমাকে পথ দেখালেন। নফস আর বিবেকের এ লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বিবেকই বিজয়ী হলো। মানবতার লাজ রক্ষা পেলো। ভয়-ভীতি ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উপর এই বিশ্বাসের জয় হলো যে, আমি

তো এক মুসলমান! মুসলমান তো প্রবৃত্তি ও বিবেকের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সময় সে পথই গ্রহণ করে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। আমার সামনে এখন বসে আছেন এক অসহায় মজলুম ইনসান, যিনি একদিন আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন। আজ আমি যদি তার হাত না ধরে জুলুমের হাতকে শক্তিশালী করি তাহলে আল্লাহ্র না-রাজি (অসন্তুষ্টি) ছাড়া কিছুই পাবো না আমি।

আর যদি উপকারী বন্ধুর পাশে দাঁড়াই, এক মজলুমের জন্যে জীবন-মরণের ঝুঁকি নিই, তাহলে খলীফা হয়তো না-রাজ (অসন্তুষ্ট) হবেন কিন্তু আল্লাহ আমার প্রতি অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই তো এক মুসলমানের চরম ও পরম কাম্য!
আমার মনে পড়লো হযরত হাসান বসরীর কথা। ইরাকের শাসনকর্তা ইবনে হোবায়রা একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–

'খলীফা ইয়াজিদ বিন আবদুল মালিক অনেক সময় আমাকে অন্যায় আদেশ করে বসেন। অধীনস্থ হওয়ার কারণে আমি তা অমান্য করতে পারি না। এখন আমার কী করণীয়?'
জবাবে হযরত হাসান বসরী বললেন–

'ইবনে হোবায়রা! তুমি যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে খলীফা ইয়াজিদকে অসন্তুষ্ট করো তাহলে আল্লাহ তোমাকে ইয়াজিদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু ইয়াজিদকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে যদি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করো তাহলে ইয়াজিদ তোমাকে আল্লাহ্র ক্রোধ থেকে বাঁচাতে পারবে না।'

**ক্ষমা করো আমায়!**

না, এরপর আমার আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলো না। আমি প্রশান্তচিত্তে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, প্রয়োজনে জান দেবো তবু আমার মেজবানকে, আমার উপকারী বন্ধুকে আমি রক্ষা করবো। আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও।

প্রথমে আমি আমার মহান মেজবানের আরাম-বিশ্রাম ও পানাহারের সু-ব্যবস্থা করলাম। আর আমার খাস গোলামকে ডেকে বললাম– 'আজীবন তুমি আমার অনেক খিদমত করেছো। আজ আমি

তোমার কাছে জীবনের শেষ খিদমতটুকু চাই। আশা করি নিরাশ করবে না!'
গোলাম অশ্রু-সজল চোখে বললো–
'এমন করে বলছেন কেনো মনিব? আদেশ করুন, বান্দা হাজির!'
সব ঘটনা জানিয়ে আমি তাকে বললাম–

'এই নাও দশ হাজার দিরহাম! আস্তাবলের শ্রেষ্ঠ ঘোড়াটা বের করো এবং রাতের আঁধারেই তাকে বাগদাদের সীমানা পার করে দাও! বরং তাকে দামেস্কে তার বাড়িতে পৌঁছে দাও! এরপরই তুমি মুক্ত!'
আমার শরীফ মেজবানকে চিনবার আরো কিছু বাকি ছিলো, সেটাও এখন পূর্ণ হলো। ভেবেছিলাম, আমার পরিকল্পনা শুনে তিনি খুশি হবেন। কিন্তু তার চেহারা দেখে মনে হলো, তাকে যেনো বিনা ছুরিতে জবাই করা হচ্ছে। বেদনার্থ কণ্ঠে তিনি বললেন–
'বন্ধু! তুমি খলীফা আল-মামুনের চেয়ে কঠিন ফরমান জারি করছো! মাফ করো বন্ধু, এ মেনে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না!'

কোনোভাবেই যখন তাকে সম্মত করতে পারলাম না, তখন তার শারাফাত ও মহত্ত্বকেই ঢাল বানিয়ে বললাম–

'দামেস্কে আমি যখন তোমার মেহমান ছিলাম তখন তোমার দান প্রত্যাখ্যান করি নি। এখন তুমি আমার মেহমান। মেজবানের দায়িত্ব পালনে আশা করি তুমিও আজ আমাকে বাধা দেবে না! তাছাড়া তুমি নিশ্চিত থাকো– আমি আমার আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ইশারা পেয়েছি!'

এরপর আর কিছু বলার সুযোগ ছিলো না তাঁর।
অশ্রুভেজা চোখে 'আল্লাহ হাফেজ' বলে তিনি অনেকটা অনিচ্ছায়ই বের হয়ে গেলেন। যখন ঘোড়ার ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ কানে এলো,

তখন হৃদয় ও আত্মার যে প্রশান্তি অনুভব করলাম– তা শুধুই অনুভবযোগ্য!
এরপর আমি স্ত্রী-পুত্রদের ডেকে এনে পাশে বসালাম এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা খুলে বললাম।
স্ত্রী বললেন –

'আল-হামদুলিল্লাহ! আমার স্বামীকে আল্লাহ্ শরীফ ইনসানের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক দান করেছেন! আমাদেরকে আল্লাহ্র হাওয়ালা করুন, তিনিই যথেষ্ট!'
পুত্র-কন্যাদের দিকে তাকালাম। আমার হৃদয়ে পিতৃস্নেহ তোলপাড় করে উঠলো। অনেক চেষ্টা করেও উদগত কান্না রোধ করতে পারলাম না। দরদরিয়ে নেমে এলো ফোটা ফোটা অশ্রু।
আমি কি সন্তানের স্নেহের কাছে কাতর হয়ে পড়ছি?..
তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে উঠে দাঁড়ালাম।

ফজরের নামাজ আদায় করে দু'হাত তুলে আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করলাম। আগে বা পরে আর কখনো এমন মুনাজাত করার তাওফীক আমার হয় নি!

ভোরের আলো ফুটে উঠলো। চারদিক ফর্সা হয়ে এলো। এরই মধ্যে খলীফার তলব এসে গেলো।
ছেলে-মেয়েদের 'আল্লাহ্ হাফেজ' বলে আমি বের হয়ে গেলাম।
স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা অশ্রুসজল দৃষ্টিতে দরোজা পর্যন্ত এসে আমাকে বিদায় জানালো। কিন্তু আমার স্ত্রীকে আশ্চর্য রকম প্রশান্ত মনে হচ্ছিলো। তিনি শুধু বললেন–
'আমার মন বলছে, আল্লাহ্ চাহে তো আবার আমাদের দেখা হবে!'

* * *

খলীফাতুল মুসলিমীন আমাকে একা দেখে অবাক হলেন। ভ্রূ-

কুঞ্চিত করে বললেন–
'বন্দি কোথায়? যদি বলো পালিয়ে গেছে তাহলে নিশ্চিত জেনো, তোমারও আয়ু ফুরিয়ে গেছে।'
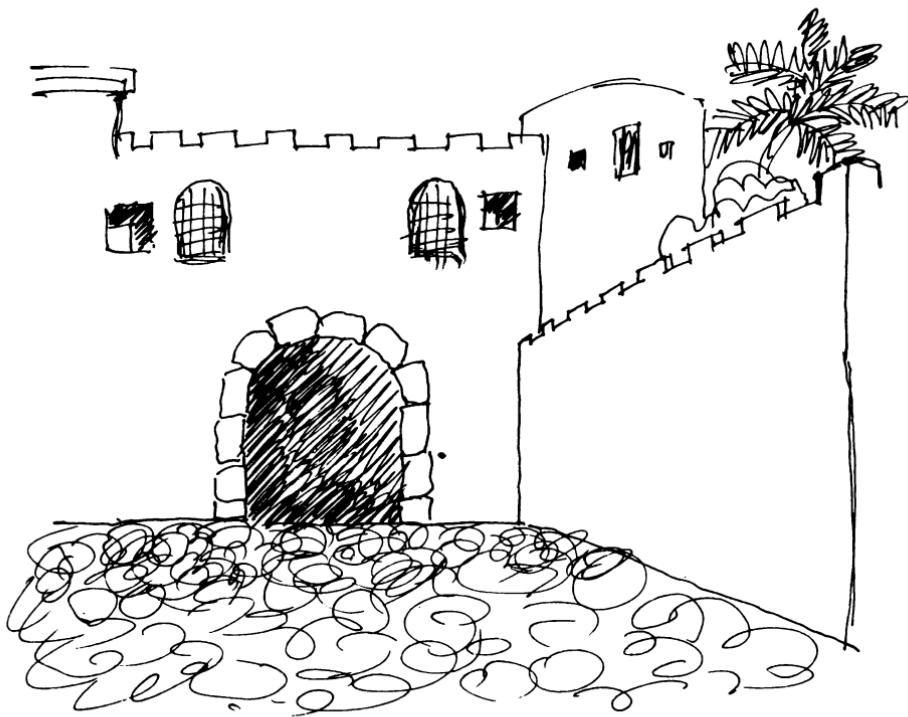
আল-হামদুলিল্লাহ! প্রাণের হুমকির মুখেও আমার কোনো ভাবান্তর হলো না। আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম–
'আমীরুল মু'মিনীন! বন্দি আপনার পালায় নি। তবে অনুমতি হলে তার সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।'
ইশারায় অনুমতি পেয়ে পুরো ঘটনা আমি খলীফার খিদমতে আরজ করলাম। তারপর আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললাম–
'আমীরুল মু'মিনীন! ওয়াফাদারী ও কৃতজ্ঞতা এবং ইনসাফ ও

ন্যায়পরতা আপনার কাছেই আমরা শিখেছি। আমি আমার বিবেকের নির্দেশ পালন করেছি। আমার মেজবান যদি নির্দোষ হয় তাহলে সৎ সাহসের পুরস্কার আমার প্রাপ্য আর অপরাধী হলে গর্দান আমার হাজির! এই দেখুন, কাফনের কাপড়! আমি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি!'

কথা শেষ করে অবনত দৃষ্টি তুলে যা দেখলাম, তাতে একদিকে আমার বিস্ময় আর অন্যদিকে আমার পুলকের কোনো সীমা রইলো না! দেখলাম, খলীফার দু'চোখে অশ্রুধারা বয়ে চলেছে! এমন মহানুভব খলীফার কাছে সত্য বলতে, একজন নির্দোষ মানুষের দুঃখের কাহিনী বলতে কেনো তবে আমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছিলাম?
অশ্রু মুছতে মুছতে খলীফা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–
'তাকে আমার কাছে এনেও তো সব কথা বলতে পারতে! তোমার কি মনে হয় যে, সব জেনেও আমি তাকে হত্যা করবো, এমনই জালিম আমি?!'
একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় দ্বাররক্ষী এসে খবর দিলো–

'আমীরুল মু'মিনীন! অভিজাত এক লোক বলছে– 'দামেস্কের বন্দি' আমীরুল মু'মিনীন-এর সাক্ষাতপ্রার্থী!'
এ-কথা শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম! খলীফা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন–
'আমি ভাবছিলাম, তোমার কথা সত্য হলে অবশ্যই দামেস্ক না গিয়ে এখানে তার ছুটে আসার কথা!'

দ্বাররক্ষী দামেস্কের বন্দিকে নিয়ে হাজির হলো। আর তিনি অনুমতির অপেক্ষা না করেই বলতে লাগলেন–
'আমীরুল মু'মিনীন! অপরাধ যা কিছু সে আমার এবং শাস্তি গ্রহণের

জন্যেও আমি প্রস্তুত। আমার কারণে এই বেকসুর শরীফ ইনসানের কোনো ক্ষতি হোক তা আমি চাই না।!'

খলীফা মৃদু হেসে বললেন–

'আচ্ছা ক্ষতি যা হবার আমারই হোক! তোমাকে দশ হাজার দিনার পুরস্কার দেয়া হলো। যদি পছন্দ করো তাহলে কিছুদিন আমার মেহমানখানায় অবস্থান করো, কিংবা শাহী ব্যবস্থাপনায় দামেস্কে রওয়ানা হয়ে যাও। তবে আব্বাসের যদি কোনো কথা থাকে– তাহলে তাই হোক।'

দামেস্কের মেহমান স্বপ্নাবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন! তারপর আল-হামদুলিল্লাহ বলে সেখানেই সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন!

আমার স্ত্রীর বিদায় মুহূর্তের কথা আমার মনে পড়ে গেলো–

'আমার মন বলছে, আল্লাহ চাহে তো আবার আমাদের দেখা হবে!'

* * *

বলতে পারো, অতীতের কোন্ স্মৃতিটা মানুষকে সবচে' বেশি হাতছানি দিয়ে ডাকে, ডেকেই চলে অবিরত? জানি না, উত্তরে তুমি কী বলবে। তবে আমার মতে- সে হলো দাদী'র গল্পের আসর! আহা! কী মধুময় সেই স্মৃতি!! শৈশবকালে দাদী'র কাছে গল্প শোনার সেই গাল-ফোলানো ও কপাল-কুঁচকানো বায়নার কথা- কে ভুলতে পারে?..

শিশু হয় কিশোর, তারপর পরিণত যুবক। তখনও সে ভুলতে পারে না চাঁদনি রাতের মায়াবী জোৎস্নায় দাদী'র গল্পের আসরের সেই স্মৃতি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে গল্পের প্রতি তার এই ঝোঁক ও আকর্ষণ। তার কেবলই ছুটে যেতে ইচ্ছে করে- সেই হারানো শৈশবে, মাদুরপাতা উঠানে, দাদী'র কাছে, চাঁদনি রাতের সেই গল্পের আসরে!

পাঠক! আমার বড়ো কষ্ট লাগে যখন গল্পের প্রতি শিশু-কিশোরদের এই ঝোঁক ও আকর্ষণকে আমরা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হই। আর আমাদের ব্যর্থতায় দুশমনরা আমাদের গল্পপ্রিয় শিশু-কিশোরদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়-গল্প নামের বিষ! আমাদের এই গাফিলতির জন্যে আল্লাহ কি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন?

হ্যাঁ পাঠক! এই দায়বোধ থেকেই আমি প্রিয় শিশু-কিশোর বন্ধুদের জন্যে লিখেছি এই গল্প সিরিজ– ইতিহাসের সত্য কাহিনী অবলম্বনে। ইতিহাসকে অবিকৃত ও অক্ষুণ্ন রেখে শুধু গল্পের জামাটা পরিয়ে দিয়েছি ইতিহাসের গায়ে।

-আলী তানতাভী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা